প্রথম বর্ষ
১ম সংখ্যা

মাসিক

শ্রাবণ
১[illegible]১।

President—Jitendranath Chatterji B.L.

Editor in-chief—Akshaykumar Roy.

আরাধনা।

খুলনা, বি, কে, ইউনিয়ন স্কুলের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীপুলিন বিহারী বসু

সহ-সম্পাদক—শ্রীসুধাংশু কুমার রায়।

দুই আনা

বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

সূচীপত্র।

আরাধনা।

প্রথম বর্ষ	শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।	প্রথম সংখ্যা।

জন্মপল্লী।

আমার জনম পল্লী,
ওগো আমার হৃদয় আলো।
তোমারেই যদি ভাল নাহি বাসি,
তবেত মরণ ভালো।
তুমি প্রভাতী গীত ভার,
শত বাঞ্ছিত অয়ি মনোমোহিনি।
দেবতা আরাধনা।

ওগো হৃদয়ের বাণী তুমিঃ,
তন্দ্রার মাঝে নূপুর মন্ত্রে
শুনি বাজে ঝুন ঝুমি।
তুমি, আমার হৃদয় আলো,
ওগো, তোমারেই যদি ভাল নাহি বাসি
তবেত মরণ ভালো।

তুমি, স্নেহ শিশিবেব ঝাবি,
এ মহাযুগেব শ্মশান ভবিয়া
সাজাইয়া সাবি সাবি।
জ্বালো, জ্বালো আবো আলো,
ওগো, তোমাবে ছাড়িয়া স্ববগ বহিতে
আমিত পাবি নে বালো।

আজি জগতেব সেবা লাগি,
তোমাব দুয়াবে হে দেবতা মম
দেবতাব বব মাগি।
বিশ্বেব আজ ভাল বাসিবাবে
সবাবে কবিতে ভালো,
হে মোব হৃদয আলো,
তোমাবেই যদি ভুলে যাই শেষে
তবেত মবণ ভালো।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ।

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

স্থিব শান্ত নদীবক্ষে নৌকাবোহণ কবিযা যাইতে যাইতে হঠাৎ এক ঘূর্ণবাত্যা উঠিযা নদীজল আন্দোলিত কবিযা যদি নৌকা ডুবাইযা দেয, তবে জলমগ্ন ব্যক্তিদেব যেরূপ দুর্দ্দশা হয, আজি আশু বিহনে, মাত্র যুবকদিগেব কেন, সাবা বাঙ্গালাব প্রতি নবনাবীবই বোধ হয ঐরূপ অবস্থা হইযাছে। এই মহাপুরুষেব জীবনেব প্রতি ঘটনাগুলিই লিখিবাব পক্ষে প্রযোজনীয, কিন্তু তাহা লিখিলে বোধ হয একখানি পুস্তক তৈযাবী কবা যায। সুতবাং অতি অল্পেব মধ্যে তাঁহাব জন্য দুই চাবি কথা লিখিলাম।

১৮৬৪ সালের ২৯ শে জুন কলিকাতায় মলঙ্গালেনস্থ ভবনে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ডাক্তার স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইঁহার জনক এবং স্বর্গীয়া জগত্তারিণী দেবী ইঁহার জননী। গঙ্গাপ্রসাদ যখন ডাক্তারী করিতেন তখন তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কেহ ছিলেন না। তিনি বলিতেন "রোগীর বাড়ী চিকিৎসক ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যাইতে বাধ্য"। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে সেই সময়কার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ছেলে যাহাতে মানব নামে পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারে তাহাই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। এই জন্য তিনি কখনও পয়সা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, পুত্রের কখনও কোন পুস্তকের প্রয়োজন হইলে বাজারে সেই শ্রেণীর যতগুলি পুস্তক পাওয়া যাইত তাহা তিনি আনিয়া হাজির করিতেন। ছেলেকে কখনও ভৎসনা করিতেন না। নানা প্রকার গল্পের ভিতর দিয়া তাহাকে সৎ কার্য্য শিক্ষা দিতেন এবং অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতেন।

আশুতোষ শৈশবে চক্রবেড়ের বঙ্গবিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালায় সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৮৭৯ সালে সাউথ সুবার্ব্বন বিদ্যালয় হইতে অতি রুগ্ন অবস্থায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এ সময়েও তিনি সুস্থ ছিলেন না। ১৮৮৪ সালে বি, এ, গণিতে প্রথম হন এবং (বিজ্ঞানে) অনার্সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে ফিজিকাল সায়েন্সে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বৎসরই রায়চাঁদ—প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ হাজার টাকা বৃত্তি পান। ১৮৮৮ সালে তিনি সিটি কলেজ হইতে বি, এল, পাশ করেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানী যুবক ছিলেন। স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত প্রখর ছিল যে, সারা জীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনাটী স্মৃতির বহির্গত হয় নাই। তিনি এত বেশী পড়িয়াছিলেন যে অনেকে ধারণা করিত, "তিনি অনেক অধ্যাপক অপেক্ষা বেশী জানেন"। পরকালে তিনি শুরুশাস্ত্রের জটিল সমস্যার সমাধান

করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। কলেজে পাঠকালে সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদনাময়ী বক্তৃতায় মাতিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট দেশ-সেবার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের হাইকোর্টে বিচারকালে যে যুবকদল ফলাফল সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হইয়া সার্জ্জেণ্টের সহিত সংঘর্ষেও পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ হয়েন নাই; আশুতোষ তাহাদিগের অন্যতম।

১৮৮৮ সালে আশুতোষ ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য পদবাচ্য হন। ১৮৯৪ সালে 'Doctor of law' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনেটের সভ্য ও পরে সিণ্ডিকেটের সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ সালে বঙ্গের কাউন্সিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করেন। ১৯০১ সালে পুনরায় ঐ পদে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৯০৩ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর মেম্বর হন এবং বঙ্গ-কাউন্সিলের নন্-অফিসিয়াল-গণের প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। তথায় ইউনিভারসিটি আইন-কমিটীর সদস্য হইয়া বর্ত্তমান ইউনিভারসিটী-আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৯০৪ সালে হাইকোর্টের জজ হন। ১৯০৬ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত পর পর চারিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। ১৯২১ সাল হইতে ২৩ সাল পর্য্যন্ত পুনরায় ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৭ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত একবার এবং ১৯২৮ সালে দ্বিতীয়বার এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রেসিডেণ্ট হন। রায় চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাওয়ার পর এডিনবরা রয়াল সোসাইটীর সদস্য হন। Sadler commissioner-এও কয়েক বৎসর সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজ আদর্শে গড়িতে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; এমন কি অনেক সময় রাত্রে পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিন্তা তাঁহার নিদ্রা নাশ করিয়াছে। আশুতোষের নিমন্ত্রণে বহু দেশ হইতে বহু পণ্ডিত লোকের পদার্পণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করিয়াছে, যে আইন দ্বারা লর্ড কার্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে খর্ব্ব করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই আইনের

সাহায্যেই তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে এত বড় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এ দেশের ও চীন জাপান প্রভৃতি নানা দেশের বহু প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ও মানচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন কৌশলে কার্য্য করিতেছিলেন যাহাতে প্রাচ্য শিক্ষার্থীর যদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হয় তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হইতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে; এইস্থানে পৃথিবীর যত শিক্ষার্থী সব ছুটিয়া আসে; এইখানে ভারতের অতীত গৌরব সেই নালন্দা স্থাপিত হয়। আশুতোষ বঙ্গ-ভাষাকে উচ্চ শিক্ষায় পরিণত করিয়া গিয়াছেন। হয়তো তাঁহার সাহায্য না পাইলে এ ভাষা কি ভাবে দেশে চলিত বলা যায না। যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার বহু পূর্ব্বেই মা সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিত তাহারাই আশুর কৃপায় হাজারে হাজারে বি, এ, এম, এ, পাশ করিতেছে; তাই আজ বঙ্গদেশেই ভারতবর্ষের শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আইন ব্যবসায় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনেকদিন দেশী কার্য্য ছাড়িতে হইয়াছিল। গোখলের সময় তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। তথায় গোখলে ব্যতীত আর কেহই তাঁহার সমান কৃতীত্ব দেখাইতে পারেন নাই, এই সভায় যথেষ্ট কৃতীত্ব দেখানই তাঁহার হাইকোর্টের জজ হওয়ার প্রধান কারণ, জজীয়তীতেও তাঁহার কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নজীরের ভিতর দিয়া অনেক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাতে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা না দেখাইয়া বর্ত্তমান সমাজের অনুরূপই করিয়াছেন। বিচার-কার্য্যে স্বীয় স্বাধীন মতের পরিচয় দিতে ক্রুটী করিতেন না।

একদা এক সাহেব তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে বাঙ্গালীর গ্রেডে এক চাকুরী দিবেন বলিয়া ডাকাইলেন, কিন্তু তিনি সাহেবের গ্রেডের চাকুরী চাহিলেন। সাহেব ভবিষ্যতে উন্নতির কথা জানাইলেন; কিন্তু তাহারও কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া এ কার্য্য করিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্ভ্রান্ত

জবাব দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত যে কোন যুবকই বোধ হয় ইহাতে রাজী হইত, কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাহেব চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মী, বাগ্মী, সবল ও স্নেহশীল ব্যক্তি বিরল। তাঁহার বিচারশক্তি এবং শৃঙ্খলাশক্তি প্রশংসার্হ, এই নির্ভীক ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যে বাধা পাইলে উত্যক্ত হইতেন, কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে আবার তাহাতে ব্রতী হইতেন।

তাঁহার ধনী দরিদ্র সকলের প্রতি সমভাব ছিল। দরওয়ান কখনও তাঁহার দ্বারে দৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতে হইলে কাহারও Card লইয়া যাইবার প্রয়োজন ছিল না অথবা সাহেবী কায়দায় সজ্জিত হইয়া যাইতেও হইত না, স্ব স্ব ইচ্ছামত সকলেই ঘরে ঢুকিতে পারিত। কোন সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইলে অথবা রাজদরবারে যাইতে হইলেও ধুতি চাদর পরিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখা গিয়াছে, স্বজাতীয় গৌরব হ্রাস করিয়া বিলাতী পোষাকে ভূষিত হওয়াটা তিনি পছন্দ করিতেন না।* অবশ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে পরিতে হইত। এই তেজস্বী ব্যক্তির গৃহে কোন সাহেব সাক্ষাতের নিমিত্ত আসিলেও তাঁহার সহিত খালি গায়ে নিঃসঙ্কোচে দেখা করিতেন। তিনি জনসেবা ও দেশসেবা গোপনে করিয়া গিয়াছেন। বহু দীন দরিদ্র লোক তাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল।

কার্জ্জন সাহেব আশুতোষকে বলিয়াছিলেন, যে "বড়লাট সাহেবের হুকুমে তাহাকে বিলাত যাইতেই হইবে।" কিন্তু তিনি ইহাতে নির্ভয়ে উত্তর করেন "বড়লাট কেন তদপেক্ষা উচ্চপদস্থ কেহ আজ্ঞা করিলেও তাহা অবহেলা করিয়া তিনি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিবেন" আর একবারের কথা বলি,— আশুতোষ আলিগড় হইতে প্রথম শ্রেণীতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, পথে তিনি নিদ্রামগ্ন হইলে এক সাহেব সেই গাড়ীতে উঠিল। আশুতোষের নাগরাই জুতা জোড়া সাহেবের বিরক্তির কারণ হইল। [illegible] সাহেব ফেলিয়া

দিল। তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই জুতা না পাইয়া এবং সাহেব ব্যতীত আর কাহাকেও তথায় না দেখিয়া স্বীয় জুতার অবস্থা বুঝিলেন এবং সাহেবকে অন্য পার্শ্বে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া তাহার কোটটী ফেলিয়া দিলেন। সাহেব যখন ঐ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন your coat has gone to fetch my shoes.

ওকালতী আরম্ভ করিবার কিছু পূর্ব্বে তিনি বিনাপণে কৃষ্ণনগরের রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার চারি পুত্র তিন কন্যা। বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জীবিত কালেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা কমলা দেবী ইহলীলা সংবরণ করেন। পঁচিশে মে, সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার সময় পাটনায় এই মহাপুরুষের তিরোভাব হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইতে কিছু বাকী ছিল।

শ্রীনলিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

সোনার খাঁচা।

এক পরাক্রমশালী রাজার ছিল একটা পোষা পাখী। পাখীটাকে তিনি অতি যত্নে বন হইতে ধরিয়া সোনার খাঁচায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমটা সে কিছুতেই পোষ মানিতে চাহে নাই; শেষে যখন দেখিল যে, আর উপায় নাই, তখন অগত্যা বোধ হয় পোষ মানিল। রাজা গুরু রাখিয়া তাহাকে অনেক কথা শিখাইলেন, পাখীও ক্রমে নিজের অভ্যস্ত বুলি ভুলিয়া রাজার শিখানো বুলিতে মগ্ন হইয়া গেল।

সে অনেক দিনের কথা। একদিন খাঁচার দরজা উন্মুক্ত পাইয়া

পাখী উড়িয়া গেল। রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পাখী উড়িয়া গেল কেমন করিয়া ?

মন্ত্রী বলিলেন, একদিন খাদ্য দিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল, দরজাও খোলা ছিল তাই উড়িয়াছে।

রাজা কহিলেন, "এতদিন তবে কি শিখাইলে ?"

মন্ত্রী মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, শিখান ঠিকই হইতেছিল, কিন্তু —

রাজা রাগিয়া কহিলেন, কোন কিন্তু শুনিতে চাইনা। আমার পোষা পাখী আনিয়া দাও।

বিরাট একটা সভা মন্ত্রীর কক্ষে বসিল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা আর কথা কাটাকাটির পরে ঠিক হইল যে পাখী বড় পেটুক জাতি। খাইতে পাইলেই আর কিছু চাহে না। খাদ্যের লোভ দেখাইয়া পাখী ধরা হউক।

তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি শস্য ছড়াইয়া দেওয়া হইল। এক এক করিয়া বনের সমস্ত পাখী আসিয়া জুটিল। আর মন্ত্রীর আদেশে ব্যাধের জালে তখনই ধরা পড়িল।

মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, পাখী ধরিয়াছি। রাজার আর আনন্দ ধরে না, ঘন সোনার তারে ঘেরা বড় এক খাঁচায় পাখী আবার বন্ধ হইল।

রাজা বলিলেন, পাখী বুনা হইয়া গিয়াছে। উহাকে নূতন করিয়া আমার স্তুতি গান শিক্ষা দাও।

সে দিন হইতে আবার শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কিন্তু পাখী আর কথা কহে না, অথবা পারে না।

শিক্ষক যত কথার আদর্শ তাহার কাছে ধরে, সে করে কেবল কিচির মিচির আর কিচির মিচির। আকাশে মেঘটা একবার ডাকিয়া উঠিলে নিরর্থক সে একবার ডানার ঝাপটা মারে। বৃষ্টি পড়িলে দরদালানের মধ্যে গুটি সুটী মারিয়া গাছতলাটীর মত বসে, বুঝি ভিজিয়া যাইবার ভয়ে! তার না আছে সে বুদ্ধি, না আছে সে ডাক, কেবল ছটফটানি তার কাজ, আর

কিছুই সে জানেনা। রাজা ভারি বিমর্ষ হইলেন।

তবু কি করা যায়, প্রাণ নেওয়া সহজ কাজ, কিন্তু ফুটানো সহজ নহে। ফুল আপনিই যে দিন ফোটে সেদিন ফোটেই। যেদিন ফোটেনা সে দিন কেহই তাহাকে ফুটাইতে পারে না।

হঠাৎ আর একদিন খাঁচার দরজা মুক্ত পাইয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, পাখী তোকে সোনার খাঁচায় রাখিয়াছিলাম, তবুও তুই পলাইতে চা'স!

পাখী বলিল, চাই মহারাজ, লোহার শিকল যেমন আটকিয়া রাখে সোনার শিকল কি তেমনই রাখে না?

রাজা বলিলেন, পাখী তুই নেমকহারাম।

পাখী কহিল, তুমি আমায় খাঁচায় রাখিবে কেন?

রাজা কহিলেন, তুই নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবি না বলিয়া।

পাখী। পারিবনা কেন? ছাড়িয়া দিলে দেখিতে, পারি কি না।

রাজা। পথে পড়িয়া মারা যাইবি।

পাখী। মরিতে হয় মরিব, পাখীরা যেমন করিয়া মরে গাছের তলে।

রাজা। অপঘাতে?

পাখী। হ্যাঁ মহারাজ, কারণ তোমাদের গুলিতে মরা পাখীর স্বাভাবিক, তোমাদের নির্দ্দয়তায় মরা পাখীর নিত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের দয়া দিয়া মরণ ঘটাইতে চাহি না।

রাজা কহিলেন, ছিঃ—

পাখী। তাই বলিয়া তোমার খাঁচায় কেন থাকিব?

রাজা। এতকাল পালন করিয়াছি বলিয়া।

পাখী। কেন মহারাজ, আর সবাইত তোমার বিনা দয়ায় বেশ পালিত হইতেছে।

রাজা। তারা বুনো।

পাখী। পাখীরা বুনোই মহারাজ।

রাজা দুঃখ করিয়া কহিলেন, তুমি চলিয়া গেলে আমার কষ্ট হইবে।

পাখী। কেন? খাঁচাটী শূন্য হইল বলিয়া?

রাজা। বনে তুমি না খাইয়া মরিবে।

পাখী। বিচিত্র নয়, অনেকে তাই মরে বটে।

রাজা। তবে যাইও না।

পাখী। কেন মহারাজ, আপনার দয়া পাইয়া মরার চেয়ে না পাইয়া মরা কি ভাল নয়?

রাজা। সে মরণ ঘৃণার।

পাখী। তা হউক মহারাজ, তাই পাখীর স্বভাব—

পাখী উড়িয়া গেল।

মহম্মদ সোহ্‌রাব আলি খাঁন।

সমগ্র ভারত।

এমন কেহ ভারতবাসী আছেন কি, যিনি সমগ্র ভারতের ভাবটী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, ভূগোলে ভারতবর্ষের বিবরণ বাল্যকাল হইতে পাঠ করা গিয়াছে, ইতিহাসে ভারতবর্ষের কথা পুনঃ পুনঃ শুনা গিয়াছে;— আমরা ভারতবাসী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং ভারত-বাসীরই স্তনদুগ্ধে দেহ পুষ্ট করিতেছি; কিন্তু ভাই! ভারত কেহ দেখিয়াছ কি? তুমি অসাড়, কোটী কোটী হস্তের মধ্যে দুই খানি দেখিয়াছ; কেহ বা হিমালয়ের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া বনরাজির শোভা ও পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য দেখিয়াছেন, কেহ কেহ বা কুমারিকা অন্তরীপ-তটে উপবিষ্ট হইয়া ভুলা-

রাশির ন্যায় সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মত ঢেউ দেখিয়াছেন।

এই সাগর-ভূধর-পরিবেষ্টিত সহস্র পর্ব্বত-মালাপরিশোভিত, অজস্র নদীপ্রবাহ-বিধৌত শস্যশ্যামল বনরাজি-সঙ্কুল রত্নগর্ভ উর্ব্বর ভূমি, অনন্ত কোটী জীবের বিচরণস্থল, একত্রিংশৎ কোটী মানবের আবাসভূমি ভারতবর্ষ! ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—দেখিবার বস্তুই বটে। কিন্তু আমরা ভারত সন্তান, এইরূপ ভারত আমরা দেখি নাই,—দেখি না। চক্ষু থাকিতে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ, জীবন থাকিতেও মৃত। অন্ধের ন্যায় গৃহকোণে থাকিতেই আমরা ভালবাসি। উঠানযাত্রাকে সমুদ্রযাত্রা বলিয়া মনে করি।

কিন্তু এমন মনোহর তরুলতাপূর্ণ শিখরমালাশোভিত, এমন মন্দ মারুত-আন্দোলিত শস্যক্ষেত্র, এমন ধীর গম্ভীর প্রবাহধার নদ নদী; এমন শাল, তাল, তমালাকীর্ণ ঘন বিজন কানন, এমন পবিত্র সুপেয় পয়ঃ-নিঃসরণ-কারী প্রস্রবন, সেই বিদ্যুদ্দীপ্ত ঘন ঘটা-সমাচ্ছন্ন মুশলধার-স্রাবী বর্ষার আকাশমণ্ডল, আর এই কোকিল-আরাধিত বসন্তকাল; এমন কি—আর কোথাও আছে? যদি এই সকলই না দেখিলে, তবে আর দেখিলে কি?

আদি কালে ভারতের উপর করুণা বিতরণ করিতে ভগবান্ কৃপণতা করেন নাই। ধর্ম্ম কতকাল ধরিয়া কত কীর্ত্তিই না সঞ্চিত করিয়াছেন! কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, অবন্তী, এমন আর কোথায়ও আছে নাকি?

ইতিহাসে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া গৌরব বহিয়া আসিতেছে, ভারতমধ্যে কত দেশ, কত নগর, কত ভাষা, কতরূপ পরিচ্ছদ, কতরূপ বিভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহার,—এক দেশে এমন আর কোথায় আছে? দেখিবার পদার্থ বটে কিন্তু আমরা ভাগ্যহীন—দেখিলাম না—ভাবিলাম না।

পূর্ব্বে ভারতে, শিল্প কার্য্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল—উদাহরণস্বরূপ তাজমহল, সেকেন্দ্রা, ইলোরা, তাঞ্জোর, কাঞ্চী, কাশ্মীর, ভুবনেশ্বর, পূরী, বৃন্দাবন, অজন্তা, ইত্যাদি স্থানের নাম করা যাইতে পারে—সেরূপ আর কোনও দেশে হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবাসী ভারত, কাহাকে বলে জানেনা। বিলাত বা আমেরিকা বা বাহিরের যে কোন স্থানের নামেই তাহাদের হৃদয় লাফাইয়া উঠে, সে হৃদয়ে এক মাত্র ভারতেরই স্থান নাই। বিদেশের সকলেই ভারতকে বুঝে—সকলের অন্নই এই ভারতবর্ষে জুটিয়া থাকে, কেবল জুটে না এই ভারতবাসীর ; তাই সকলেই ভারতকে ভালবাসে, কেবল বাসেনা, যাঁহাদের জীবন-মরণের কর্ত্তব্য—ভারতকে, শুদ্ধ ভারতকেই মাত্র ভালবাসা, সেই ভারতবাসীই ॥

শ্রীমনীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

———o———

পদ্যে।



আজিকে প্রভাতে, এ সুখ মিলন,
এ মিলন গান, এ মন মাতান।
প্রাণের এ টান, এ হৃদি গলান,
স্ববশ মোরে ক'রেছে হে।

* * * *

নব প্রভাতের অরুণ কিরণ
চুমি' চুমি' চলে গগন পবন,
পুরিল আমার হৃদয়-কানন,
জেগেছি আমি ভুলেছে সে।

* * * * *

করুণার খনি জগতের নাথ,
দিযাছ অভয় বেয়ে চলি পথ।
পুরণ করিতে স্বীয় মনোরথ,
হয়েছি মত্ত তব ধ্যানে।

আমিও হে সখা তোমাদের মত,
গাহিব কত যে মিলনের গীত।
করুণার খনি হ'য়েছেন প্রীত,
প্রার্থিত ধন আনিব হে।

*　*　*　*

এতদিনে ওগো পোহাইবে রাতি,
অন্ধকার যাবে নিভাইব বাতি,
পক্ষীর কূজনে কলস্বরে মাতি'
সকল লোক উঠিবে হে।

শ্রীনলিনীমোহন চক্রবর্ত্তী

——:০:——

মৃত্যু ও শ্মশান।

শ্মশান এই নামটি মনে জাগরিত হইলেই যেন ভয়ানক আতঙ্কের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ উহা ভয়ানক স্থান। যে সময় শব দাহের পচা দুর্গন্ধে তাহার বাতাসটি অবধি বিষাক্ত হইয়া উঠে, সে সময় জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণাম স্মরণ করিয়া ভয়-মর না হইয়া উঠেন এমন লোক বিরল। কি সাহসী, কি ভীরু, সকলের মনে যুগপৎ এই ভাবনাটি না আসিয়া পারে না যে, তাহাকেও একদিন এইভাবে এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

জাগতিক সুখ দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, সবই এই শ্মশানে এককালে চুরমার। সৌন্দর্য্য, কৌৎসিত্য, উচ্চতা, নীচতা, কিছুরই আর ভেদাভেদ রহে না; সবই কেবল ছাই—আর ছাই। যত যাহা যত কিছু সকলই এই সুনিপুন কৃষক চষিয়া সমভূম করিয়া দেয়। জ্বালা যন্ত্রণা আর থাকে না, থাকে কেবল ছাই; নীরব অসাড়; মূক, দুর্গন্ধ, ভস্মরাশি মাত্র।

প্রত্যেকেরই সর্ব্বদা এই পবিত্র শ্মশানের নাম স্মৃতিপথে জাগরুক রাখা কর্ত্তব্য। কোন্ সময় কাহাকে এই জাতিভেদ শূন্য মহাস্থানে শয়ন করিতে হয়, তাহার স্থিরতা

নাই ; তাই সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত। মনুষ্য নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই তাহাকে তাহার সকল কর্ত্তব্য শেষ করিতেই হইবে।

মৃত্যুর পর আমরা পূর্ব্ব জন্মানুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকি। উহা স্মরণ করিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। মনুষ্য-কর্ত্তব্যের সীমা নাই। কিন্তু সময় অতি অল্প, কাজেই পৃথিবীর সকল অসার পদার্থ ত্যাগ করিয়া সার গ্রহণ করিতে হইবে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যুকালে কেহই সঙ্গে যাইবে না, এমন কি, কোন সদসদ্ গুণের পরিণাম পর্য্যন্তও না। অতএব আমরা এত কষ্ট সহ্য করিয়া আত্মীয় স্বজন এবং গরীব দুঃখীর ভরণ পোষণ করিব কেন ? যাহা উপার্জ্জন করিব নিজের জন্যই ব্যয় করিব। দেশের এবং দশের উপকারের জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করিব না। তাহারা আমার কে ?

এই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাহাদের বুঝা উচিত যে, ভগবান তাহাদের উপর যে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না করিলে মৃত্যুর পর তিনি কঠোর শাস্তি দিবেন। সেরূপ শাস্তি আর জগতের কেহই দিতে সক্ষম নহে। তাঁহার যেমন দয়ার অন্ত নাই, তেমনি কঠিনতার সীমা নাই। অতএব সর্ব্বদা তাঁহার আদেশানুযায়ী চলিতে হইবে।

সাধারণতঃ মৃত্যু দ্বিবিধ। এক প্রকারের মৃত্যু—শুধু দেহ লয় প্রাপ্ত হওয়া। অন্য প্রকারের মৃত্যু—আত্মার লয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়া। সাধারণ লোকের দুই প্রকার মৃত্যুই হইয়া থাকে ; কিন্তু মহাপুরুষের শুধু কায়িক মৃত্যুই সংঘটিত হয়। তাঁহাদের দেহ চলিয়া যায়, কিন্তু আত্মা জগতের সকল লোকের মধ্যেই বিরাজমান থাকে। যে কার্য্যের মধ্যে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই বা বিন্দুমাত্র লাভের আশা নাই, সেইরূপ দেশ-হিতকর কার্য্যে তাঁহারা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সকল পার্থিব জীবের মঙ্গল কামনা করেন। ভারতবর্ষে এরূপ অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, করিতেছেন, এবং করিবেন। মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক মহাপুরুষ। তাঁহার কি

মৃত্যু হইবে ? না। তিনি মরিয়া অনন্ত স্থান, অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার দেহ লয় তাঁহার মৃত্যু নহে। বরং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—গরিমাময় অমরত্ব।

উপস্থিত সময়ে যাহারা জগতের উন্নতিসাধন এবং মঙ্গলসাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের আর সেই মৃত্যুকে ভয় করিতে হইবে না। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু আর কিছুই নহে, বরং ঈশ্বরের দান।

"যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে, লোলুপ নিরত মম মন-মধুকরে।
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি শরনি নিশ্চিত।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

সৎকর্ম্মে কণ্টক ও তাহা নিবারণের উপায়।

যে সময়েই আমরা ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয়ে একটু চিন্তা কবি, সেই সময়েই মনে হয় নিজেকে সৎপথে রাখিয়া উন্নত মনে নানারূপ সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেশের এবং দশের উন্নতি সাধন করিব।

মনে মনে অনেক বিষয়ের চিন্তা করিতে পারা যায়। মানসচিন্তা যে মুহূর্ত্ত মধ্যে কত কর্ম্ম আরম্ভ ও কত কর্ম্ম শেষ করিতে পারে তাহার ইয়ত্বা নাই।

মনের মধ্যেত সদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া মনকে উন্নত করিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্নত মনকে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সৎ কর্ম্মের উপায় বা স্থির করিয়া নিলাম ; স্থিরীকৃত উপায়ের প্রেরণায় মনে হইতে লাগিল, যেন কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া গেল—দেশের লোকের কত সুবিধা হইল, নিজের মনে এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতি আসিয়া ছাপাইয়া উঠিল, দ্বিতীয় কার্য্যের উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময়ে আর সে সাফল্যকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নাই সে

আনন্দ—নাই সে উৎসাহ। মানস কল্পনা বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসিয়া ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া গেল। রহিল—ঘৃণা, লজ্জা, ধিক্কার, ঔদাসীন্য, আলস্য, নিরুদ্যম আর অবিশ্বাস।

কেন যে এই অসাফল্য তাহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ আমরা আত্ম-শক্তি বিষয়ে অজ্ঞ, দ্বিতীয়তঃ সৎ সাহস আমাদের অনেক কম; তৃতীয়তঃ সহিষ্ণুতা আমাদের দগ্ধ কপালে বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা করে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বোপরি লোকভয়রূপ দৈত্য এতগুলি বাধা বিপত্তির বুকে চড়িয়া আমাদের ঘাড়ে এমনি করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, যে তাহা ঠেলিয়া উদ্ধার করিবে এমন শক্তি বুঝি 'ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণুর'ও নাই।

বালির ভয়ে পলাইয়া গেলে বেচারা হনুমানও নাকি অনেক কাল লেজ গুটাইয়া সুগ্রীবের সঙ্গে সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, অথচ ফিরিয়া দাঁড়াইলে দুই চাবিটা বালিরও বোধ হয় সাধ্য ছিল না যে হনুমানের সমকক্ষ হয়; ইহা তাহার দেব-দত্ত প্রার্থনা পূরণ। কিন্তু এই অপরিমিত-শক্তি পবন তনয়ের বৃথা মুনির অভিশাপে সে ইহার খোঁজ রাখিত না—ভুলিয়া গিয়াছিল।

প্রত্যেক মানুষের নিজের যে ভিতরে ভিতরে কত শক্তি আছে সে সম্বন্ধে মানুষ অনেকেই অজ্ঞ। কিন্তু নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারি না বলিয়া ত' আর বলিতে পারি না যে মানুষের শক্তি নাই। চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতে পাই, কত লোক আত্ম-শক্তিবলে কত দুরূহ কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার শক্তি যখন আমার অপেক্ষা বেশী, তখন তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী শক্তিত' নিশ্চয়ই অনেকের থাকিতে পারে। আমিও মানুষ তাঁহারাও মানুষ। কিন্তু আমাতে তাহাতে যখন প্রভেদ আছে, তখন তাঁহাতে আর অন্যেতে যে প্রভেদ থাকিতে পারে না কে বলিল?

অনেকে মনে করেন, মানুষ আর কতটুকু শক্তি ধারণ করে? ঈশ্বরের শক্তির নিকট তাহা অতি তুচ্ছ ও সর্ব্বাংশে পরাভূত। স্বীকার করি ঈশ্বরের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, অনেক বেশী, তবে আমরাও ত ঈশ্বরের দাস। প্রভু কি ভৃত্যকে

শক্তি দেন না ? আর যদি সদুপদেশ দিয়া জগাই মাধাইকে উদ্ধার করা যায় তবে সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে সন্তুস্ট করিয়া কেন তাঁহার অনন্ত শক্তির অধিকার পাওয়া যাইবে না ? এইরূপ মনে করিয়া যদি কাজ করা যায় তবে মনের মধ্যে কত অসীম শক্তির আবির্ভাব হয় !

মানুষের যদি শক্তি থাকে তবে সে ভাল মন্দ সর্ব্ব প্রকারের কার্য্যই অতি সহজে করিতে পারে। এই সময় 'আমরা যে মানুষ' এই কথাটী চিন্তা করিবার দরকার হইবে। মানবের কর্ম্ম নীচ কর্ম্ম নয়। পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেণীর জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানবেই যদি পশুর কাজ করে তবে সে আর মানুষ কোথায় ? যখনই একটী কাজ মনে হইল, ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তখনই যদি সেই কাজ শেষ করিয়া ফেলিলাম তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি ? মানুষ ত' চিন্তাশীল ; তাহার ত' বিবেক আছে। বিবেকের কাছে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই যদি সে সব করিল তবে আর তাহার মনুষ্যত্ব কোথায় ?

যদি এইরূপে শক্তির সহিত মানব বুদ্ধিকে চালিত করা যায়, তবে সৎ সাহসে প্রবৃত্তি জন্মে। সৎ সাহস ত' শক্তি থাকিলেই হয়। তার পর বিবেক মানিয়া চলিলে মনে একটা সাহস আপনিই আসিবে।

অনেক সময় এমন একটা অবস্থা হয় যে, শক্তি আছে সাহসও আছে অথচ একটা সৎকর্ম্ম আরম্ভ করা যাইতেছে না। ইহার কারণ লোকভয়। পাছে লোকে কুৎসা গায়, কোন কথা বলে, এই ভয়ে আমরা অনেক সময় পিছাইয়া পড়ি।

এরূপ দেখা গিয়াছে যে একজন লোক ভাল জামা জুতা পরিয়া একটী মোট হস্তে চলিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন সম্মুখে তাঁহার কতিপয় বন্ধু আসিতেছেন, অমনি তিনি লজ্জায় তাহার হস্তস্থিত মোটটী অবলীলাক্রমে পার্শ্বস্থ জঙ্গলে নিক্ষেপ করিয়া বেশ সভ্য হইয়া লইলেন যেমন আজকাল অনেকেই করেন।

এখানে কার্য্যটী তিনি কোন মতেই মন্দ করিতেছিলেন না, অথচ লোকভয়ে—পাছে বন্ধুরা কিছু বলেন এই জন্য তিনি তাহার সাধের দ্রব্যসম্ভার বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। এই লোকভয় জিনিষটা মানব চরিত্রের উপর কম আধিপত্য করে না।

লোকভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবাব একমাত্র উপায় আত্মগোপন না করা। আমার যেমন অবস্থা আমি যদি সেইরূপ ভাবে থাকি, আমার যেরূপ মনোভাব তাহা যদি দশ জনের সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া ধরিতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত না হই, তবে মানুষ মন্দ বলুক আর ভাল বলুক আমার তাহা লক্ষ্য করিতে স্পৃহাও জন্মিবে না। অধিকন্তু তাহা হইলে মনের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ ভাব বিরাজ করিবে। আমার মনের উচ্চাকাঙ্খা শুনিয়া মানুষ হাসিতে পারে বটে, কিন্তু আমি যদি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ভাল হইতেই চেষ্টা করি তবে সে হাসি বেশী দিন থাকিবে না কারণ ভাল কখনই ঘৃণিত থাকে না।

উপরি উক্ত তিনটী জিনিষকে জয় করিতে পারিলে কার্য্য আরম্ভ খুবই করা যায়। কিন্তু আরম্ভ করিলে কি হয়, স্থায়ী না হইলে সবই বৃথা হইল।

কোন একটী কার্য্য স্থায়ী রাখিতে হইলে সহিষ্ণুতার নিতান্ত প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে গেলে ক্রোধকে দমন বাখিতে হইবে। ক্রোধ মানুষের শত্রু ইহা মানুষকে সর্ব্বনাশ করে। একটী কার্য্য করিতে গেলে মানুষেত' দশ কথা বলিবেই, কারণ মানুষত' আর এ জগতে এক রকমের নয়। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা রুক্ষ হইয়া উঠি তবে আমাদের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদিগেরই মনুষ্যত্বটুকুকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। সুতরাং যাহাতে এই অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ না করিতে পারে সে বিষয়ে খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এ জগতে ভাল মন্দ দুইটী জিনিষই আছে। মন্দ যাহা তাহাকে অনেক দূরে রাখিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। সবই যদি ভাল হইত, তাহা হইলে আর ভাল হইতে চেষ্টাই করিতে হইত না। ঈশ্বর মন্দটীকে দিয়াছেন ভালকে পরীক্ষা করিতে। সুতরাং মন্দকে উপেক্ষা করিয়া ভাল হওয়া যায় না। যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জয় করিতে হয়। তবেইত' ভাল হইব।

ভাল লোকে কখনও মন্দ কথা বলেন না বা ভাল জিনিষের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। সুতরাং মন্দ লোকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমরা সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা সহকারে সৎ এবং সত্যের সেবা আজীবন করিয়া যাইব। এ ধারণা মনে রাখিলে আমরা প্রত্যেক জিনিষ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি।

আমাদের কর্ত্তব্য ভাল হওয়া, তাই মন্দের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক রহিতে হইবে। ভাল হইতে হইলে মন্দের সহিত অন্ততঃ একটা সংগ্রাম না হইয়া যায় না, তাই পূর্ব্বাহ্নেই শক্তি সংগ্রহাবশ্যক।

আর ভাল একদিনে হওয়া যায় না যেমন মন্দ হওয়া যায়। ইহা অতি মন্থর-গামী; তাই ধৈর্য্যের বড় প্রয়োজন।

শ্রীরাধাচরণ ঘোষ।



পঞ্চভূত।

মাটী—(ক্ষিতি)।

মনে পড়ে, কবে যেন কাহার কাছে গল্প শুনিয়াছিলাম, ফেরিওয়ালা হাকিল, "চাই মাটী"। আর মনে আসিল সত্য সত্যই মাটী আমাদের মা'টী। ক্ষুধায় যখন প্রাণ অবসন্ন হয়ে আসে তখন যেন নিজের বুক খুঁড়ে আমাদের এই মা, বসুন্ধরা আহার দান করে। পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে যায় তখন যেন, মা তাঁর বুক খুঁড়ে জল বের করে সন্তানকে খাওয়ায়। তারপর যখন সব শেষ তখন বুক পেতে তার সন্তানকে কোলে তুলে নেয়—যেমন করে নেয় মা তার নিজের রক্তগড়া সন্তানকে। এ মায়েয় মান নাই, অপমান নাই, এ মায়ের সুখে উচ্ছ্বাস নাই, দুঃখে চীৎকার নাই, সবই শান্তি। মাটীকে দেখলে ত্যাগীর মনে আনন্দ হয়, ভাবুকের মনে ভাব উঠে, আর হয়তো পাপীর প্রাণে একটা আতঙ্কও আসে, কেননা সবই যে এই ধূলোয় মিশে যাবে। এ মায়ের অহঙ্কার নাই। ধনী বল নির্ধন বল, সবকে এ মায়ের মতই কোলে তুলে নেয়। তাই বলি মাটী বড় উপকারী। যাক—

এবার মাটীর আরও উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। পৃথিবীতে যে ভূম্যংশ তাহা জলভাগ অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু এর যে কত সহ্য করতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। কোথায় বা আগ্নেয়গিরি তার অভ্যন্তর হইতে

অগ্ন্যুৎপাত করিয়া দেশকে দেশ শ্মশান করিয়া দিয়া গেল, মানুষের আশা বিফল হইয়া গেল, সবই যে দুদিনের খেলা! আবার কোথায়ও বা সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জন করে যেন দেখাচ্ছে আমি খুব বড়। তার উদ্বেলিত বন্যাপ্রবাহে কত দেশ ভাসিয়া গেল, গ্রামের পর গ্রাম উজাড়, পল্লীর পর পল্লী শ্মশান। কোথায়ও বা মাটী ধসে পড়ে গেল। কত লোক মরিল। কোথায়ও বা মরুভূমি হইতে বাতাস বহিতেছে। গ্রামের লোক স্বীয় বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। তা' ছাড়া আজ ব্যাধি, কাল মড়ক, পরশু দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিত আছেই।

ভাবুন পৃথিবী কত সহ্য ক'রে তবে এতদিন টিকে আছে! হয়তো বা ঘুরতে ঘুরতে সংঘর্ষে সব চুরমার হয়ে যাবে। শেষই হয়ে যাবে সব, অস্তিত্বও থাকবে না। আজ এই বৃহৎ হর্ম্ম্য কাল তা' মাটীর তলে। তার কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেক প্রকারের জিনিষ আছে। এক একটীর এক এক রকমের গুণ! কোনটীর শক্তিতে মাটী উচু হয়ে গেল আবার কোনটার শক্তিতে ঘর বাড়ী সব ধসে পড়ে গেল। যখন উচু হয়ে উঠে, তখন হয়তো পর্ব্বত বা পাহাড় হয়, আর যখন নীচু হয়ে গেল, অধিত্যকা, বা উপত্যকা, বা নদী বা গহ্বর। পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডার দরুণ অথবা অন্যান্য কারণে মাটী উঁচু বা ফাঁপিয়া উঠে। আর ঝড় বাতাস, বৃষ্টি ইত্যাদিতে ধুয়ে নিয়ে গহ্বর করে দেয়।

এই প্রকার পরিবর্ত্তণ সব সময়েই হইতেছে; অথচ আমাদের দৃষ্টির বাইরে। শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রকে এক প্রকার বাতাসে সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর করে। ফ্রান্স দেশে Landes নামক উর্ব্বর দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ভূমিকম্প আমাদের বাঙ্গালায় তেমন নাই। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্যাংশে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভূমিকম্পের অত্যাচার খুব বেশী। ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুল দিয়া প্রায় তিন শত আগ্নেয়গিরি আছে। আফ্রিকার উপকুল দিয়া বা ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়া ইহার প্রচলন কম নহে।

পৃথিবীর মধ্যে অনেক গলিত ধাতু আছে, ইহা অত্যন্ত গরম। আর যদি কোন রূপে জল ইহার উপর আইসে তবে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

অনেকেই বোধ হয় ব-দ্বীপ বা Delta র নাম শুনিয়া থাকিবেন। সাধারণতঃ নদী বা সাগরে যে স্থানে স্রোতের অভাব এমত মুখ দেশই এই Delta গড়িয়া উঠে। যখন নদী প্রবাহিত হয়, তখন ইহার স্রোতের নানা প্রকার ময়লা তলানী পড়ে। এবং এইগুলিই জমা হইয়া ব-দ্বীপ আকারে সঞ্চিত হয়।

প্রবাল দ্বীপ বড় বড় সমুদ্রে প্রবাল বা Coral নামে এক প্রকার কীট আছে তাহারা যখন মরিয়া যায় তখন তাহাদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া সঞ্চিত হয় ও ক্রমে বড় দ্বীপে পরিণত হয়।

শুনিতে পাওয়া যায় ইহাদের অধ্যবসায় অনুকরণীয়। যখন ইহারা একবার দ্বীপ গাথিয়া তুলে তখন ঢেউয়ের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। আবার গাথে, আবার ভাঙ্গে। এইরূপেই ইহারা বড় বড় দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। তাই কবি কহিয়াছেন :-

So the little coral workers
By their slow but constant motion
Have built those pretty islands
In the distant dark blue ocean.

সমুদ্রের গাছপালা ইহাতে বাধিয়া থাকে ও ক্রমে ক্রমে রমনীয় বাসস্থান হয়।

পাহাড়ের গায় পাহাড় হইতেই মাটী তৈয়ার হয়, সে স্থানে ঘাস ও ক্রমে গাছ পালা হয়। যখন ক্রমান্বয়ে পার্শ্বদেশে বৃষ্টি বা জল পড়ে তখন ইহাতে ফাটাল হইয়া যায়। আবার অন্যান্য কারণে এই সকল স্থান আরও গভীর ও ক্রমে একেবারে ফাটিয়া যায়। এইরূপে পাহাড়ের তলদেশে মাটি প্রস্তুত হয়।

সমতল ভূমির নানা প্রকার নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন Amazon নদীর বনভূমিকে Selvas বলে। উত্তর আমেরিকার বনভূমিকে Prairies ও Savanas কহে। দক্ষিণ আমেরিকার সমতল ভূমিকে Llanos বলে। এই সকল স্থানে মাঝে মাঝে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। রুশিয়ার বরফাবৃত ভূমিকে Steppes বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

———:০:———

নীরবে।

নীরবে চেয়ে আছি পথপানে,
আসিও যবে তব পড়ে মনে।
জাগিয়া থাকি একা আমারে দিও দেখা
বাঁচাও তৃষিতেরে বারি দানে॥

কবে যে ঘুমঘোরে এসেছিলে,
আসিবে আশা দিয়ে গেছ চলে,
সে কথা ভুলি নাই, জীবন আছে তাই,
আবার তোমা ধনে পাব বলে॥

বলেছ প্রাণে প্রাণে বাঁধা রবে,
কেন গো ভাবি সদা দূরে তবে!
অবোধ প্রাণ কেন অধীর হয় হেন
দেখে সে আপনারে একা ভবে॥

থাকিত মোহ ঘুমে মুদে আঁখি
তবুও সুস্বপন টুটে দেখি,
সরোষে কাঁপে হিয়া নেহারি চমকিয়া
আঁধারে চারিদিক আছে ঢাকি।

হৃদয় পথহারা আন মনে,
ব্যাকুল ছুটে তাই তোমা পানে,
তোমারি বাহু তলে লুকাতে যাই ভুলে,
আশার ভাষা কই মন মানে॥

আঁধারে জ্যোতি-রাশি নিরবধি,
তুমি যে আমারি সুখনিধি ;
কাহারে নাহি চাই কাহারে না ডরাই ;
তোমারে অবচ্ছেদে পাই যদি।

শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ।

নাম যশ।

যৌবনে যেদিন নিত্যানন্দ হঠাৎ কবি হইয়া পড়িল, সেদিন যেরূপ কেহই বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল না, সেইরূপ বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে সে গ্রামের কোণে হঠাৎ নিতাই কবিরাজ হইয়া আসিলে. তাহাতেও কেহই আশ্চর্য্য হইবার হেতু খুঁজিয়া পাইল না। তাহার বাল্যকাহিনী যাহারা অবগত ছিল, তাহারা সকলেই জানিত কবি বা কবিরাজ হওয়া নিত্যানন্দের পক্ষে বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে। কারণ এই দুইটার কোন গুণই তাহাতে বর্ত্তমান ছিল না।

নিত্যানন্দের বংশটা শুদ্ধই যেন কেমন খাপ-ছাড়া ছিল। তাহার পিতা একদিন অকারণে নিজের গলায় দড়ি টাঙ্গাইয়া সেই দড়ি গাছে বাঁধিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। পিতামহ নিরর্থক একটা মানব হত্যা করিয়া সেই যে কোথায় উধাও হইয়াছিলেন, অদ্যাবধি কেহ তাহার খোঁজ পায় নাই। প্রপিতামহ একবার পূজায় বলি দিতে দিতে এক জোড়া নরবলিই দিয়া ফেলিলেন! তখন নিত্যানন্দের পূর্ব্বপুরুষেরা জমিদার ছিলেন। তবে এতকথা বিশ্বাস হয় না, কারণ এ সবের কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নাই। কিন্তু একটা বনের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া গ্রামবাসীগণ সেই নরবলির উল্লেখ এখনও করিয়া থাকে। উহার মধ্যে একটা বিশিষ্ট গাছতলায় নাকি উহা হইয়াছিল, এবং এখনও সেখানে বলিদান করিয়া কেহ বিফল মনোরথ হয় না। সাধারণের বিশ্বাস।

কিন্তু সে সব পুরাতন কথা, এবং ইহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। নিত্যানন্দ সে সব মোটেই বিশ্বাস করিত না। বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনও ছিল না। গ্রামের মধ্যে তাঁহার নাম যশ যথেষ্ট ছিল। সেও সারা দিনমান রোগী দেখিয়া ও সন্ধ্যা বেলায় তার-ছেড়া বেহালা

খানিতে সুর চড়াইয়া একমনে শেষ বেলাকার গান গাহিত। একটী রোগী বাঁচাইয়া সে বুক ফুলাইত; একটী মরিয়া গেলে সে কবি-জনোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মুহ্যমান বান্ধবগণকে বুঝাইয়া দিত, মরা, মৃতের প্রয়োজনই ছিল। আর বিশেষতঃ মানুষ একদিন মরিবেই। সুতরাং—ইত্যাদি।

কিন্তু গোজামিল তাহার ধরা পড়িল, এবং ভাল করিয়াই ধরা পড়িল সেই দিন, যেদিন সে ও পাড়ার একটী ছেলেকে চিকিৎসা করিতে গিয়া লক্ষ্মণ কুণ্ডুর পুত্র পাশ করা ডাক্তার পরেশ নাথের সম্মুখে পড়িয়া গেল। জ্বরাক্রান্ত রোগীকে স্নান করান' তাহার নূতন নহে, কিন্তু স্নান করাইতে গিয়া পাশ করা ডাক্তারের সম্মুখে পড়া, এই প্রথম। সুতরাং হঠাৎ যখন পরেশনাথ 'হা হা' করিয়া আসিয়া পড়িল, তখন প্রথমটা সে হতভম্ব হইয়া গেল। জ্বরের ঘোরটা একটু বেশী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা এই গোলমালের জন্যেই হউক, ছেলেটী কেমন এলাইয়া পড়িল। ফলে ছেলেটির জননী কাঁদিয়া উঠিলে, এবং পিতা দয়া প্রার্থনা করিয়া পুত্র বয়সী পরেশনাথের পায়ের উপরই গড়াইয়া পড়িলে, পরেশনাথ গম্ভীরভাবে নিজেই ছেলেটীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিল, আর বুকের ব্যথা বুকেই চাপিয়া নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে গৃহের দিকে রওয়ানা হইল।

চিকিৎসা ব্যবসায় তাহার সেই খানেই শেষ। পিতৃগৃহে বেড়াইতে আসিয়া লক্ষ্মণ কুণ্ডুর পুত্র গ্রামবাসীর একান্ত অনুরোধ এড়াইয়া আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিল না। এবং নিতাই কবিরাজ তাহার সুরভাঙ্গা বেহালাখানিকে নিবিড়ভাবে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বাজাইতে লাগিল বাহিরে যাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ,ভিতর তাঁহাকে একদিন দেখিতে পাইবে। মন, সেই দিন যেন তোমার দেখিবার মত সংস্থান থাকে, আজি হইতে তাহা সংগ্রহ করিও।

কিন্তু গান তাঁহার বেশী দিন চলিল না। যেদিন শিশু পৌত্রটী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, ঠাকুরদাদা, আমার গলার হার দাও, এবং দাসী জানাইল যে অর্থের অনটন বশতঃ তাহা কয়েকদিন পূর্ব্বে বাঁধা দেওয়া হইয়াছে; সে দিন সে দেখিল যে গান গাহিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, এবং শেষের দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে গেলে, বর্ত্তমান দিনগুলি কাটান কষ্টকর। তথাপি কি করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সে পিতৃহীন পৌত্রটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল শুধু সেই কথা, যেরূপভাবে পুত্র তাহার পুত্রকে নির্ভাবনায় পিতার হস্তে তুলিয়া একদিন নিশ্চিন্তভাবে মহাপ্রস্থান করিয়াছিল। আজ এই পঞ্চম বৎসরের শিশুটীকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে আছে একমাত্র সেই।

পরদিন তাহার ঘরে আর বেহালা বাজিল না। তাহার স্থানে সকাল বেলায় নিত্যানন্দকে তাহার ভাঙ্গা বৈঠকখানায় ঔষধ পত্রের মধ্যে ব্যস্ত দেখা গেল। ময়লা, আবর্জ্জনা সব

নির্ব্বাসিত হইল। ভাঙ্গা টেবিল চেয়ারগুলি সজ্জিত হইল। গ্রামের সকলেরই চক্ষুতে এটা পড়িতে বিলম্ব হইল না যে কবিরাজের গৃহের পূর্ব্বদিকের জানালাটা আর বন্ধ নাই সেটা খুলিয়াছে, এবং নিতাই পূর্ব্বের মত চশমা নাকে বসিয়া গম্ভীর ভাবে পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে।

কিন্তু হায়, যাহা হয় নাই তাহা গড়িয়া তুলা বরং সহজ কিন্তু ভাঙ্গা হাট জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা বৃথা।

সকলেই শিশি হাতে তাহার গৃহের সম্মুখ দিয়া পরেশনাথের গৃহের দিকে চলিয়া যায়। কতক কতক পরে ফিরিয়া আসে, কিন্তু তাহার দিন যেরূপ বৃথা আসিল, সেইরূপ বৃথা গেল।

রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়া পৌত্রটি বায়না ধরিল দুগ্ধ না হইলে সে খাইতে পারে না। শুনিয়া নিতাই এর মুখে করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব সে দমন করিল; মুখে হাসি ফুটাইয়া শিশুকে ভুলাইবার জন্য সে কহিল, "হ্যা দাদা, মামার বাড়ী যাবি ?"

মামার বাড়ীর নামে শিশু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কহিল "হ্যা ঠাকুর দাদা, যাব!— মামীমা আমায় পায়েস দেবে বলে ছিল।

খাওয়ার কথা আবার উঠিয়া পড়ায় নিতাইএর মুখ মলিন হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে কোন কথা সে আর কহিল না।

আহারান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া সে তাহার ঔষধ পত্রের মধ্যে বসিয়া পড়িল। হস্তপদগুলি সব অবসাদে ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই অবসাদকে সে মানিয়া লইল না। তাহার বিবেক তাহাকে চেতাইয়া দিল—না গরীব সে আর থাকিবে না—কখনই না।

রাস্তার উপর দিয়া পরেশনাথ যাইতেছিল। জানি না মনে তাহার কি হইল যে মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, "পরেশনাথ বাবু!"

পরেশ ফিরিয়া চাহিল, এবং পরক্ষণেই রাস্তা হইতে নামিয়া দরজার গোড়ায় আসিতে আসিতে কহিল "আমি আবার বাবু হ'লাম কবে জ্যাঠা মশাই ?"

লজ্জায় নিতাইএর মুখ কালো হইয়া উঠিল। যে গ্রাম্য সুবাদে পরেশ তাহাকে আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করিত, তাহার রেশ সে এখনও টানিয়া রাখিয়াছে এবং নিতাই একেবারে চুকাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে, ইহা ভাবিয়া অসমতার ধাক্কে সে নাকাল হইয়া উঠিল। করুণ কণ্ঠে মাথা নাড়িয়া সে কহিল, "তা বৈকি বাবা, এখন পাশ টাশ করে—"

পারুল হাসিয়া কহিল, "আপনি কি আমাদের এমনি ভাবেন যে পাপ কার্য্যে বাপ ঠাকুরদা আমাদের নমস্কার করেন।"

নিতাইএর মুখ নীচু হইয়া পড়িল। কিন্তু পারুল এ প্রসঙ্গটা উলটাইয়া দিয়া বলিল, নূতন [illegible] ছোট মেয়েটীর বড় অসুখ। আমি সেখান থেকেই আসছি [illegible]। আহা মেয়েটী বোধ হয় আর বাঁচবে না।

[illegible] নিত্যানন্দ [illegible] কহিল "কি অসুখ?"

পারুল কহিল [illegible] হইয়াছে। অনেক [illegible] করিয়াও বমি বন্ধ [illegible] না আর দুই একটা কথা [illegible]

নিত্যানন্দ [illegible] ছাড়িয়া [illegible] সেই [illegible] কথা, সেদিন তাহাকে না [illegible]। আর [illegible] অসুখ [illegible] খবরও দেয় না। এমনকি [illegible]

সন্ধ্যার পূর্ব্বে [illegible] ও ছেড়া [illegible]

নিতাই [illegible] বাহির হইল [illegible]

উপস্থিত [illegible] ঘোষের [illegible] হইয়াছিল। [illegible]

[illegible] অভাব ছিল না। একটী [illegible] সকলেই সেখানে

একত্র হইয়া ধূমপান করে [illegible] কিন্তু [illegible] দেখিয়া [illegible]

[illegible] বন্ধ হইয়া গেল ও [illegible] সে অস্বস্তি

বোধ [illegible] লাগিল।

তথাপি সে ভাব সে [illegible] না। [illegible] করিয়া [illegible] উপস্থিত

একজন প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'গণী ভায়া, [illegible] নাকি অসুখ?'

প্রশ্নটা ঠিক আত্মীয়ের মত শুনাইল না। প্রচ্ছন্ন [illegible] তাহার [illegible]

দিয়া উঁকি মারিতেছিল। [illegible] গণী ঘোষ বলিল

যে তাহাই এবং এইমাত্র [illegible] জীবন সংশয়

হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

[illegible] চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে সমবেদনার 'আঃ

আহা' প্রভৃতি ধ্বনি উঠিতে লাগিল। নিতাই মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হায়,

কেমন করিয়া সে কহিবে যে আজ সে [illegible] আহ্নিক নাই। রোগী দেখিতে আসিয়াছে।

[illegible] তাহাকে চেতাইয়া দিল। এত [illegible] সুযোগ। এত বড় সুযোগ তার ঘটিয়া

না! বহুদিন পরে আজ সে রোগী পাইতে আসিয়াছে, এবং এখন রোগী মহাজনকে তাহার প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

উত্তেজনায় তাহার পদ কাঁপিতেছিল! চক্ষু কপালে তুলিয়া কোনমতে সে বলিল, কোথায় যে রোগী সে একবার দেখিবে। উপস্থিত সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে তাহার এই অস্বাভাবিক ভাব পানে অবাক হইয়া তাকাইল। অনেকের মুখে ঘৃণাব্যঞ্জক কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল। একটা বকাটে ছেলে বলিয়াই ফেলিল যে তাহার চেয়ে হাতনা কানাইকে আশু সংবাদ করিতে প্রস্তুত আছে।

শশী একটা নিশ্বাস ফেলিল, কিন্তু নিতাইকে নিরস্ত করিল না। একটা চাকরকে ডাকিয়া নিতাইকে তাহার সঙ্গে বাড়ীতে পাঠাইয়া কহিল "তুমি গিয়ে দেখে এস খুড়ো। আমি সে ভার সহ্য করতে পারব না।"

রোগের নেশা নিতাইকে পাইয়া বসিয়াছিল। সুতরাং রুগ্নের শয্যা পার্শ্বে গিয়াও তাহার হুঁস হইল না যে এই রোগী বাঁচাইবার ঔষধ মুনি ঋষিরা তাহার ছেঁড়া পুস্তকখানাতে লিখিয়া যান নাই। শুধু তাহার মনে ছিল যে, আজ তাহার হয় উন্নতি না হয় পতন। বহুদিন পরে আজ সে নাম জাকাইবার পন্থা পাইয়াছে। সুতরাং সে মরিয়া হইয়া উঠিল, এবং পকেটের মধ্য হইতে কোন্ বড়িটী বাহির করিয়া যে রুগ্নকে খাইতে দিল, তাহা তাহার মনে রহিল না।

রোগীকে দেখিয়া বাহিরে যখন আসিয়াছে, তখন সর্ব্বাঙ্গে তাহার ঘাম জমিয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাহাকে ছাপাইয়া ধরিল। কিন্তু নিতাই না দমিয়া হাসিমুখে সকলকে থামাইয়া কহিল, রোগ অতি সামান্য, ইহাপেক্ষা অনেক বড় রোগ সে সারাইতে পারে। যে ঔষধ সে দিয়াছে, তাহাতে রাত্রির মধ্যেই বমি বন্ধ হইবে।

ডাক্তারী-সুলভ তীক্ষ্ণ হাসি তাহার ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল। এবং অসহ্য বক্র হাসি উপেক্ষা করিয়া সে কবিরাজের মত গৃহে ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া নিতাই ডাকিল, দাদা!

পৌত্রটী নিকটেই কোথায় খেলা করিতেছিল, আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।—নিতাই চাহিয়া দেখিল দিব্য গৌরবর্ণ ছেলেটী, মাথায় এক ঝাঁপি কোঁকড়া ঝাকড়া চুল। সরস অধর, সপ্রতিভ চক্ষু, সে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়া কহিল,"মামার বাড়ী যাবি?

মামার বাড়ীর অস্পষ্ট স্মৃতি বালকের মনে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। সেই যে গাছপালায় ঢাকা ক্ষুদ্র গ্রামখানি, একপাল ছেলে দিনরাত তাহার বুকের উপর ছোট ছোট প্রজাপতির মত ঘুরিয়া বেড়ায়। উৎফুল্ল হইয়া বালক কহিল "চল ঠাকুরদা।"

"চল" বলিয়া নিতাই পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইল। আঁকা বাঁকা পথ ঘুরিয়া ক্রমে গভীর বনের মধ্যে চলিল। বাহিরে যখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নাই, ভিতরে তখনই রাত্রি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আর সে বন এত নিস্তব্ধ, বাহিরের কোলাহল যেন বাহিরেই ঝাপা-ঝাপি করে, ভিতরে সে মৃত্যুর মত স্থির, নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া গাছ পালা গুলিকে নাড়াইয়া দিয়া যায়, যেন বন জঙ্গল একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। পাখীগুলি পর্য্যন্ত ডাকে না।

অন্ধকারে ভয় পাইয়া শিশু নিতায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "ঠাকুর দাদা।

শিশুর মাথার পরে হাত দুইখানি রাখিয়া নিতাই সান্ত্বনা দিল, "ভয় নেই দাদা।

অনেক দূরে একটা কাঁটাল গাছতলায় সে পৌত্রকে কোল হইতে নামাইল। —হাত পা তাহার আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সেই অন্ধকারেও ঠাকুরদাদার রক্ত বর্ণ চক্ষুর তাপ অনুভব করিয়া বালক ডাকিল, "ঠাকুর দাদা।"

গাছটীর সহিত বালকটীকে বাঁধিতে বাঁধিতে নিতাই কহিল, ভয় নেই দাদা!"

বালকটী মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িল। অন্ধকারে তাহার বুদ্ধি জড়াইয়া আসিল। একটা হাত সে খুলিয়া ফেলিয়া নিতাইএর দিকে বাড়াইয়া দিয়া ডাকিল, "ঠাকুর দাদা!"

হাত খানিকে শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সে কহিল "ভয় নেই দাদা।"

বালকটীর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে সে ডাকিল, "ঠাকুর দাদা।"

নিতাই ফিরিয়া দেখিল, তাহার প্রপিতামহ যেমন করিয়া একদিন দেবতার পূজা দিয়াছিলেন, আজ তেমন করিয়া সে তাহার সর্ব্বস্ব এখানে বলি দিতে পারিয়াছে কিনা! তাহার কণ্ঠ হইতে ধোঁয়ার মত বাহির হইল, "ভয় নেই দাদা!"

তাহার পরে সে গৃহের দিকে ফিরিল।"

পশ্চাৎ হইতে আচ্ছন্ন বালক ডাকিল "ঠাকুর দাদা।"

নিতাই আশ্বাস দিল " ভয় নেই দাদা!"

বনের বাহিরে আসিয়া সে একটী বেদীর মত স্থানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। মনে মনে ও বাহিরে কি জানি কহিল, তাহা বুঝা গেল না। প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় মনে হইল যেন বনের মধ্য হইতে আচ্ছন্ন স্বরটী তখনও বাহিরে আসিতেছে। 'ঠাকুর দাদা!

হাত তুলিয়া নিতাই আশ্বাস দিল "ভয় নেই দাদা!"

সম্মুখ হইতে কে ডাকিল, "ঠাকুর দাদা!"

নিতাই কহিল " ভয় নেই দাদা!

বাড়ী ফিরিয়া সে আর একবার বেহালা খানিকে অন্ধকার হইতে টানিয়া বাহিরে আনিয়া সুর চড়াইল। পরে বাহিরে এক খানি চৌকী পাতিয়া সেটাকে বুকে নিয়া বসিল একবার আকাশের দিকে চাহিল। একবার গহন অরণ্যটার দিকে চাহিল পরে গৎ তুলিল, "ভয় কি, আরে ভয় কি? ভয় যাহাকে ভয় করে তাহার আবার ভয় কি?—ভয়ের আবার ভয় কি?

পরদিন শশী জন কতক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার বাড়ী আসিল। নিতাইকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূরিত স্বরে কহিল, "তোমায় আমরা চিন্‌তে পারিনি নিতাই খুড়ো। তুমি কানাইকে প্রাণ দিয়েছ, আজ একবার দয়া করে আমার বাড়ী চল! সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক রজত মুদ্রা বাজিয়া উঠিল।

নিতাই তখন বাজনার সাথে মুগ্ধ ছিল চুলগুলি যাহার কাল পাকিয়া ছিলনা তাহা ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, চোখদুটী ভিতরের দিকে অনেকটা ঢুকিয়া পড়িয়াছে। নাকটা উঁচু হইয়াছে। আর হাত দুটী তারের উপর আছড়াইয়া বাজাইতে লাগিল, "ভয় কি? আরে ভয় কি? আলোকে যাহাকে দেখা যায় না অন্ধকারে সে জগতে অধিকাংশ বাঁধা হয়েছে। ভয় সেখানে ভয় পাইয়া মরিবে, সুতরাং তোর আর ভয় কি?

পরিপূর্ণতা।



(দর্শন)

আজ একখানা বই পড়্‌ছিলাম। উৎসাহের ঝোঁকে কতখানি যে প'ড়ে গেছি তা' ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। যখন হঠাৎ জেগে উঠেছে তখনই বইখানা শেষ হ'যে গেল। বন্ধ ক'রে মনে করলুম, আঃ এত শীঘ্রই—" যেন এর পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু এইখানেই মস্ত একটা ভুল ক'রলুম। আমরা মনে করি যে গাছে ফল হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু ঝ'রে পড়া অস্বাভাবিক। অথচ দেখিনা যে কত বড় একটা পরিপূর্ণতা নিয়ে ফলটা প'ড়েছে। জগৎপাতার সুশৃঙ্খলায় সমস্ত

জিনিষের ভেতরেই একটা পরিপূর্ণতা ফুটে উঠ্‌তে পারে, ছায়ার্গা ম'রে যায়, আমরা ভাবি বড় একটা অসম্পূর্ণতা র'য়ে গেল। কিন্তু তার মহান্‌ পরিপূর্ণতা আমাদের চোখে পড়েনা। বৃদ্ধ আত্মীয় ম'রে যায়; আমরা কাঁদি কেন, সে ম'রে গেল ব'লে; কিন্তু একবারও তাঁকে ধন্যবাদ দিনা যে সে কতবড় একটা পরিপূর্ণ জীবনটাকে সার্থক ক'রে গেল। ফুল যদি কেবল অহরহ ফুটেই থাকে তবে কে সেদিকে আগ্রহ ক'রে চেয়ে দেখ্বে? গাড়ি যদি কেবল চল্‌তেই থাকে তবে তার সার্থকতা কি? শিশুকাল হ'তেই যদি আজীবনকাল জীবনস্রোত ব'য়ে যায় তবে জীবনের সার্থকতার হিসাব হ'বে কোথায় যাইয়া? ফল যদি কেবল পেকেই ডালে থাকে তবে তার মূল্য কি?

ফল হবে, পাক্‌বে, পড়্‌বে এই তার ধর্ম্ম। অন্য ফল তার স্থানে আসিয়া তাহার সার্থক করা জীবনের আড়ালে নিজের আদর্শটাকে মহান ক'রে নেবে। যদি সে না আস্‌তে পারে তবে তোমার আদর্শ টা খুব খাটো হ'য়ে প'ড়বে না কি? তুমি তোমার জীবন সার্থক ক'রে তুল্‌তে পার কিন্তু অন্যের অভাবে তোমার জীবনের পরিপূর্ণতা সাধিত হবে কি দিয়ে?

রুদ্ধ বাতায়ন যদি রুদ্ধই থেকে গেল, তবে তোমার জ্যোতির মূল্য কি? যে আলোর পাশে আঁধারের সমাগম নাই সে আলো আলোই নহে। যে মানুষের দুঃখ নাই সে মানুষ মানুষই নহে। গান গাবে গেয়ে যাও, কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে থেমো, যেখানে একটা মহৎ পরিপূর্ণতা সার্থকতার হাত ধ'রে অপেক্ষা কচ্ছে। যদি না থামো তবে তোমার গানের মূল্য নাই, তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে গেছে!

বসন্ত শেষ হ'য়ে গেছে, কিন্তু ঠিক গ্রীষ্মের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া। আবার গ্রীষ্ম ঘুরিয়া ঠিক বর্ষার দ্বারে পশরা নামাবে। কারণ বর্ষা একটা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে যে। গ্রীষ্ম যদি বর্ষার দ্বার ছাড়িয়ে যায় তবে তার এতকালের একটা সার্থকতাময় জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। কিন্তু বর্ষাকে পার হ'য়ে যাবে না।

তাই বল্‌ছি শেষটা শেষ হ'য়ে যায় ব'লে যে আমরা ক্ষুব্ধ হই তা' না। শেষটাকে পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়ে বিচার ক'রে দেখিনে ব'লে।

মহম্মদ সোহরাব আলি খান।

সম্পাদকের বক্তব্য।

সে আজ অনেক দিনের কথা, ... সুন্দর সেই বাণী জননীর পূজার প্রাক্কালে আমাদের মনে হয়েছিল একটা মাসিক পত্রিকা বের কর্‌বার কথা, যা আজ সকলকে দেখবার জন্যে এ... বাঁচিয়ে এই সভার মধ্যে এনে ফেলেছি। সেদিন হয়তো ইচ্ছাটা ছিল একটা তরুণ মনের চপলতা—চপলতাই মাত্র। মানুষের হিংসা, ভ্রূকুটী, উপহাস ... পেলে হয়তো এ মরেই যেত, এতদিন—থাকতোও না, আর হতও না।

কিন্তু যিনি ভাঙ্গবার ... করেছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ, অবদনাকে ধন্যবাদ। মানুষ একে হিংসা করেছিল, তাদের কেউ একে ভাঙ্গেনি। তুচ্ছ, ক্ষুদ্র অনাদৃত পর্যালিতা শক্তি একে ... কঙ্কালের মত খাড়া করেছিল সেই মাঘ মাসে বিদ্যাদায়িনী ... বাণী জননীর আরাধনার সময়।

সেই মাঘেই আমরা প্রথম আরাধনা বার করেছিলাম। তারপরে দীর্ঘ ছয়টা মাস সময় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে। ... ... হাতে হাতেই বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

আজ সপ্তমমাস। কিন্তু এইবারে আমাদের ক্ষুদ্র হাতে গড়া আরাধনাকে নবজীবনে উদ্বোধিত করতে চলেছি। ... কেমন একটা উৎসাহ, ... থাকতে পারলে না।

এই জগতের কর্ত্তাকে নমস্কার, তাঁর কর্ম্মকে নমস্কার, তার করণকে নমস্কার, হে দেবাদিদেব! আমাদের চোখে তুমি যে তোমার অসীম কৃপাসিন্ধুর এক কণা স্মরণ করেছ, তোমার সেই শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ণ উত্তেজক সম্প্রদানকে আমাদের কোটি কোটি অভিবাদন।

... আরাধনাকে আমরা বাঁচাবার মতলব করেছি। জানিনা এই সঙ্কটার দিনে একে বাঁচানো যাবে কিনা, তবে এটা ঠিক যে যদি বা নাই পারি একে বাঁচাতে তবুও দুঃখিত হবো না। কারণ এ মরলে আমরা শিখতে পারবো কেমন করে একে বাঁচানো যাবে। তাই ফেরবার এ আর মর্ত্তে পাবে না। আরও এক কথা, মাসিক পত্রিকা—আমরা মাসিক পত্রিকার জন্যে যত না করেছি, তার চেয়ে বেশী করেছি আমাদের জন্যে। তাই এর উন্নতির চেয়ে আমাদের উন্নতিই আমাদের বেশী লক্ষ্য। ঐ মূলক—আমাদের উন্নতি চাই।

* * * * * *

বাঙ্গালার অনন্যপ্রতিভ মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে সমগ্র বাঙ্গালা, বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে অন্ধ-মতন হয়ে পড়েছে॥

বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির গত কয়েকটী অধিবেশনে তাঁর অভাব যে সদস্যগণের মধ্যে কি রকম তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল, সদাশয় গভর্ণর লর্ড লিটনের উক্তিতে তাহা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালায় আর নাই, কিন্তু হায়, তাঁহাকে যে আজ বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে গভর্ণর বাহাদুরের চেষ্টায় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা জিনিষটী বহাল রয়ে গেল।

এবার Vice-Chancellor হয়েছেন একজন সাহেব জষ্টীস্ গ্রীভস্।

নবনির্বাচিত ভাইস-চ্যান্সেলারকে আমরা সাদরাভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। তাঁর হাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দিন দিন উন্নত হ'ক এই আমাদের আশা।

*   *   *   *   *

আমাদের পরে একটা নূতন কর ধার্য্য করা হয়েছে। বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন কাজেই আর আমরা ভিক্ষুকের মতন হাত পাতবো না—এই হ'ল এর উদ্দেশ্য, লাইব্রেরী, ঘর দরজা, আসবাব-পত্র, পুরস্কারে ব্যয়, সব এই টাকায় হবে।

এ যদি হয়, আমরা সুখী হব। কারণ ব্যয়ের জিনিষগুলির মধ্যে বোধ হয় আমাদের পত্রিকাটা কর্তৃপক্ষের চক্ষু হতে মুছে যাবে না।

আমাদের কথা।

পরিদর্শন :— গত ২৩শে জুলাই প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্সপেক্টর বাহাদুর এই স্কুল পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের হস্তলিখিত চিত্র-সংবলিত মাসিক পত্র দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ছাত্রগণকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গত ১৮ই জুলাই স্থানীয় পাদ্রীসাহেব, মিষ্টার শ স্কুল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে এত বড় স্কুল যে এখানে আছে, ইহা তাঁহার ধারণাই ছিল না।

সাহায্য :— স্কুলের গৃহ, আস্‌বাব পত্র ও লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য স্কুল কমিটী অন্য কোথাও আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অধিকাংশ অভিভাবকের মত লইয়া ঐ গুলি সংগ্রহের জন্যে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে বার্ষিক দুই টাকা করিয়া সাহায্য লওয়া স্থির করিয়াছেন। খাস্ সরকারি স্কুল ভিন্ন এইরূপ সাহায্য প্রায় প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রকে স্কুল রক্ষার জন্য করিতে হয়। আশা করি স্কুলের উন্নতিকামী অভিভাবকগণ ইহাতে আপত্তি করিবেন না। স্কুল গৃহগুলির উন্নতি অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

শিক্ষা :— অমনোযোগী ও অলস ছাত্রদিগকে সংশোধিত করিবার জন্য সুবিবেচনা করিয়া জরিমানা, আটক প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। শুক্রবারে মুসলমান ছাত্রগণের উপাসনার সময় স্কুলে হিন্দুদিগেরও moral instruction "নৈতিক শিক্ষা" দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হইতেছে।